দৈনিক ইনকিলাব 62

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

# আরবী ও ইসলামী শিক্ষা করে দেওয়ার অশুভ চক্র

মোহাম্মদ আবদুল খালেক

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিষয় দুটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। ইসলামী শিক্ষা প্রথম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলকভাবে এবং উচ্চ মাধ্যমিক থেকে স্নাতকোত্তর শ্রেণী পর্যন্ত ঐচ্ছিকভাবে চালু আছে। আরবী বিষয়টি ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে উর্ধ্বে সকল শ্রেণীতেই ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে পাঠক্রমভুক্ত আছে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দের মধ্যে অনেকেই এ বিষয় দুটির প্রতি সর্বদা বিমাতাসুলভ আচরণ করে আসছেন। তারা বিষয় দুটিকে শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে বিদায় করে দিতে অথবা তা না পারলে অন্ততঃ বিষয় দুটিকে গুরুত্বহীন করে রাখতে সদা তৎপর রয়েছেন।

সাম্প্রতিককালে এমন কিছু ঘটনার সৃষ্টি হয়েছে যার ফলে এ কথা দিবালোকের মত সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিদের কারসাজিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও টেকস্ট বুক বোর্ড এ বিষয় দুটি শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে তুলে দিতে চাচ্ছেন। ১৯৯৬ সালেই শিক্ষা মন্ত্রণালয় এসএসসি পরীক্ষায় ইসলামী শিক্ষার মোট নম্বর ১০০-এর স্থলে ৫০ নম্বর করে আদেশ জারি করে। কিন্তু সারা দেশব্যাপী তীব্র প্রতিবাদ ও আন্দোলনের মুখে এই আদেশ প্রত্যাহার করে ইসলামী শিক্ষার নম্বর পুনরায় ১০০ করা হয়। ১৯৯৬ সাল থেকে টেকস্ট বুক বোর্ড ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত এই তিন শ্রেণী থেকে আরবী বিষয়টি তুলে দিয়ে তদস্থলে চারু ও কারুকলা শিক্ষা দেওয়ার উদ্যোগ নেয়। তবে বোর্ডের উদ্যোগ স্কুলগুলোতে এখনও পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি।

প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ইসলামী শিক্ষা বাধ্যতামূলকভাবে পাঠক্রমভুক্ত থাকলেও এ বিষয়টির পাঠদান করার জন্য ধর্মীয় শিক্ষকদের কোন পদ সৃষ্টি করা হয়নি। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে ঘটনাক্রমে কোন মাদ্রাসা পাস শিক্ষক থাকলে ভালই নতুবা এসএসসি/এইচএসসি পাস শিক্ষকদেরকেই ইসলামী শিক্ষার পাঠদান করতে হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ন্যূনপক্ষে আলিম পাস একজন ধর্মীয় শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করা উচিত ছিল। কিন্তু তা কখনও হয়নি। এসএসসি/এইচএসসি পাস যে শিক্ষকগণ এ বিষয়টি পড়ান তাদের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা নেই কারণ এইচএসসি পর্যায়ে ইসলামিক স্টাডিজ নৈর্বাচনিক। এসএসসি স্তর পর্যন্ত ইসলামিক স্টাডিজ বাধ্যতামূলকভাবে পড়ালেও এই জ্ঞান দিয়ে একজন সাধারণ শিক্ষকের সঠিক পাঠদান এ বিষয়ে সম্ভব হয় না। তবুও তাদেরকে কোন প্রকারে কাজ চালিয়ে নিতে হয়। শোচনীয় অবস্থা চরমে উঠে যখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক অমুসলিম হন, তখন তাদের কারও ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে কোন জ্ঞান থাকার কথা নয়। তবু যেহেতু বিষয়টি বাধ্যতামূলক সেজন্য একজন অমুসলিম শিক্ষককে ইসলাম ধর্ম শিক্ষা দিতে হয় একজন মুসলিম ছাত্র/ছাত্রীকে। এর চেয়ে পরিহাসের বিষয় আর কি হতে পারে? অবস্থার শোচনীয়তার এখানেই শেষ নয়। এতদিন প্রাইমারী ট্রেনিং ইনস্টিটিউটগুলোতে ইসলাম ধর্ম শিক্ষার ব্যাপারে খণ্ডকালীন প্রশিক্ষক দিয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু নিয়মিত প্রশিক্ষক নিয়োগের বিষয়টি বিগত ১৪ বছর ধরে ঝুলছে বলে জানা গিয়েছে। অতএব, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইসলামী শিক্ষার অবস্থা যে দারুণ অবহেলায় লেজেগোবরে একাকার হয়েছে সে কথা বলাই বাহুল্য।

মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে অবস্থাও করুণ। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের সফলভাবে পাঠদানের জন্য সরকার সকল শিক্ষকের বিএড ডিগ্রী বাধ্যতামূলক করেছেন। শিক্ষকবৃন্দও বিএড ডিগ্রী গ্রহণ করছেন। বিএড কোর্সের পাঠক্রমে দেখা যায় যে, মাধ্যমিক স্কুলের বাধ্যতামূলক ও নৈর্বাচনিক সকল বিষয়ের শিক্ষা পদ্ধতি পাঠ্যভুক্ত আছে, নাই শুধু আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ। ইসলামিক স্টাডিজ ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক হলেও এর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজে নেই। একটি বাধ্যতামূলক বিষয়কে যদি একজন প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষক পাঠদান করেন, তবে ছাত্র/ছাত্রীদের সুষ্ঠু শিক্ষা লাভ কি করে সম্ভব?

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে, বিএড পাঠ্যক্রমে অতিরিক্ত বিষয় হিসাবে বিপুল সংখ্যক বিষয়ের নাম আছে যার মধ্যে 'ইসলামী আদর্শবাদ' একটি। ভাবনার বিষয় যে, ৮/১০টি অতিরিক্ত বিষয়ের মধ্যে 'ইসলামী আদর্শবাদ' পড়ার জন্য কি ক'জন প্রশিক্ষণার্থীও পাওয়া যাবে? অতিরিক্ত বিষয় না পড়লেতো কোন ক্ষতি নেই। মাধ্যমিক স্কুলে যারা আরবী/ইসলামী শিক্ষা বিষয়ে পাঠদান করেন তারা সাধারণত ফাজিল/কামিল পাস। সরকার তাদের সনদকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর মানের বলে গণ্য করেন এবং সে মোতাবেক তারা বেতন-ভাতাদিও পেয়ে থাকেন। কিন্তু ফাজিল পাস শিক্ষকদের কোন টিচার্স ট্রেনিং কলেজে বিএড কোর্সে ভর্তির সুযোগ দেওয়া হয় না। তারা যদি বিএড কোর্সে ভর্তির সুযোগ পেতেন তবে হয়তো তারা অতিরিক্ত বিষয় হিসাবে হলেও 'ইসলামী আদর্শবাদ' বিষয়টি অধ্যয়ন করতে পারতেন। দুর্ভাগ্য এখানেই শেষ নয়। দশটি সরকারী টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থাকলেও শুধুমাত্র ঢাকা টিটি কলেজে একজন ইসলামী শিক্ষার শিক্ষকের পদ আছে। অন্য কোন কলেজে এই শিক্ষা নেই শিক্ষকের পদও নেই। ঢাকা টিটি কলেজে যে শিক্ষক আছেন, তিনি যদি নিজ প্রয়োজনে টিটি কলেজ ছেড়ে অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে বদলী হন তবে তো সব শেষ। সকল টিটি কলেজে ইসলামী শিক্ষা শূন্য হবে। অথচ বিএড সিলেবাসে অতিরিক্ত বিষয়ের একটি আছে 'ইসলামী আদর্শবাদ'।

বিপাকের এখানেই শেষ নয়। মাধ্যমিক স্কুলে ইসলামিক স্টাডিজে যারা পাঠ দান করেন, আগে তাদের পদবী ছিল হেড মৌলভী বা ক্লাসিকাল টিচার এবং তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল ন্যূনতম ফাজিল পাস। তাহলে দেখা যাচ্ছে, ফাজিল পাস নন এমন একজন বিএ বিএড ডিগ্রীধারী সহকারী শিক্ষক ইসলামিক স্টাডিজে পাঠদান করবেন, যার এ বিষয়টি পড়াবার যোগ্যতা নেই। শুধু তাই নয়। ইসলামী শিক্ষার শিক্ষকবৃন্দের সাধারণত আমল ও আখলাক ভাল। তাদের দেখলেই মানুষের ভক্তি শ্রদ্ধা জাগে। এখন অনেকেই যারা আলেম নন অথচ ইসলামী শিক্ষায় পাঠদান করেন তারা হয়তোবা নামাযও আদায় করেন না। এরপরও কোন কোন শিক্ষক ও শিক্ষিকা হন উগ্র এবং আধুনিক, যাদের বাস্তব জীবনের সাথে ইসলামের সম্পর্ক খুবই কম অথচ তিনি ইসলামী শিক্ষার ক্লাস নেন। বর্তমান ব্যবস্থায় তাই ফাজিল পাস শিক্ষকদের চাকুরীর সুযোগও সংকুচিত হয়েছে।

টেকস্ট বুক বোর্ডের কর্তারা ইসলামী শিক্ষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে সদাব্যস্ত। মাঝে মাঝে তারা জনগণের কাছে প্রশ্নমালার মাধ্যমে জানতে উদ্যোগী হন যে, মাধ্যমিক স্কুলে ইসলামী শিক্ষা বাধ্যতামূলকভাবে পাঠদানের কোন প্রয়োজন আছে কিনা? ইসলামী শিক্ষা বিদ্বেষী লোকের অভাব নেই এদেশে। এরূপ প্রশ্নমালা পেলে এই বিদ্বেষীরা শত শত নয়, হাজার হাজার পত্র তৈরী করে জানিয়ে দেবে যে, ইসলামী শিক্ষার প্রয়োজন নেই। আর তখন টেকস্ট বুক বোর্ড কর্তৃপক্ষ সানন্দে ইসলামী শিক্ষা তুলে দেবেন, না তুললেও গুরুত্বহীন ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে পাঠ্যক্রমভুক্ত করবেন। তবে এ দেশের জাগ্রত জনতা টেকস্ট বুক বোর্ডের এই ষড়যন্ত্রকে কখনও সফল হতে দেয়নি। ফলে ইসলামী শিক্ষা তুলে দেওয়ার হীন ষড়যন্ত্র সফল হয়নি।

তবে টেকস্ট বুক বোর্ডের ষড়যন্ত্র যে একেবারেই সফল হয়নি, একথা বলা যাবে না। এইচএসসি পর্যায়ে তারা সফল হয়েছে। সাবেক উচ্চ মাধ্যমিক সিলেবাসে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার সকল শাখা যথা— বিজ্ঞান, কৃষি বিজ্ঞান, বাণিজ্য এমনকি সঙ্গীত ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি শাখার ছাত্র-ছাত্রীরাও চতুর্থ বিষয় হিসাবে ইসলামী শিক্ষা বিষয়টি গ্রহণ করতে পারতো। বর্তমান সিলেবাসে দেখা যায় যে, টেকস্ট বুক বোর্ড উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার উল্লিখিত সকল শাখা থেকে ইসলামিক স্টাডিজ তুলে দিয়েছে। শুধু মানবিক শাখায় এই বিষয়টি রাখা হয়েছে। তাও নৈর্বাচনিক বিষয়সমূহের কতিপয় গুচ্ছের নিগড়ে এমনভাবে বাঁধা হয়েছে যে, যে কোন একটি গুচ্ছের অন্যান্য বিষয় বাদ দিয়ে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করতে ছাত্র-ছাত্রীরা সহসা আগ্রহী হবে না। অতএব গুচ্ছের গ্যাঁড়াকলে ফেলে ইসলামী শিক্ষা বিদায় করে দেওয়া সম্ভব হবে। কি অপূর্ব কৌশল!

কলেজ পর্যায়ে ইসলামী শিক্ষা বাধ্যতামূলক নয়। এটি একটি ঐচ্ছিক বা নৈর্বাচনিক বিষয়। ছাত্র-ছাত্রীরা কলেজপূর্ব জীবনের দশটি বছরে ইসলামী শিক্ষা বিষয়টি পাঠ করায় তারা এতটুকু বুঝতে পারে যে, ইসলামী শিক্ষা শুধু একটি তাত্ত্বিক বিষয় নয়, এটি একটি ব্যবহারিক বিষয়, একটি প্রায়োগিক বিষয় যা আমৃত্যু সমগ্র জীবন দিয়ে অনুশীলন করতে হয়। এই বোধশক্তির উন্মেষের ফলেই বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী উচ্চ মাধ্যমিক ও ডিগ্রী পর্যায়ে এই বিষয়টি গ্রহণ করে, যদিও এটি নৈর্বাচনিক বিষয় বা চতুর্থ বিষয়। এ কারণেই একজন বিজ্ঞানের ছাত্র, একজন বাণিজ্য বিভাগের ছাত্র, এমনকি একজন গার্হস্থ্য অর্থনীতির ছাত্রী অন্য বিষয় বাদ দিয়ে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করতো।

ইসলামী শিক্ষা এমন একটি বিষয় যা আজীবন অনুশীলনযোগ্য, যার অনুশীলনের অভাবে সমাজ উচ্ছন্নে যায়। সামাজিক মূল্যবোধ ও নৈতিক মূল্যবোধে ধস নামে। তবে ইসলামী শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ অনেক কলেজেই নেই। অনেক কলেজ কর্তৃপক্ষ তথা কলেজের অধ্যক্ষ ও পরিচালনা পরিষদ এই বিষয়টি নিজ নিজ কলেজে চালু করতে চান না। তারা এক ধরনের উন্নাসিকতায় ভুগেন। ইসলামী শিক্ষার নাম তাদের কাছে সহনীয় নয়। ইসলামী শিক্ষার এই সার্বজনীন আবেদনের কারণেই এই বিষয়টি প্রথম শ্রেণী থেকে স্নাতকোত্তর শ্রেণী পর্যন্ত কম-বেশী বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এদেশের কোন সরকারই এ বিষয়ে উদ্যোগ নেয়নি। কলেজ পর্যায়ে বিষয়টি নৈর্বাচনিকই থেকে গিয়েছে। আবার কলেজ কর্তৃপক্ষ বিষয়টি চালু না করার ফলে নৈর্বাচনিক বিষয় হিসাবেও ছাত্র-ছাত্রীরা তা গ্রহণ করতে পারে না। এতদিন কলেজ কর্তৃপক্ষ ইসলামী শিক্ষার অধিভুক্তি না চাইলে ছাত্র-ছাত্রীরা ইসলামী শিক্ষা বিষয়টি গ্রহণ করতে পারত না। এখন অবস্থা আরও শোচনীয়। খোদ শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ অলিখিতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, আর কোন কলেজে এ দুটি বিষয় খোলা হবে না। আর যেখানেও বিষয় দুটি আছে সেখানেও দুটি বিষয়ের শিক্ষকদের শূন্যপদ পূরণ করতে দেওয়া হবে না। বিনা অনুমতিতে কোন কলেজে কোন ছাত্র এ বিষয় নিয়ে থাকলে তাকে পরীক্ষার সুযোগ দেওয়া হবে না। দেশের জনসাধারণের মধ্যে শোরগোল চলছে যে, বর্তমান বছরে যেসব নতুন কলেজ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আশীর্বাদপুষ্ট হয়েছে সেগুলোতেও ইসলামী শিক্ষা ও ইসলামের ইতিহাস পড়াবার অনুমতি নেই। উল্লিখিত ব্যবস্থার কুফল ফলতে শুরু হয়েছে। যে সকল কলেজে এইচএসসি কোর্সে ইসলামী শিক্ষা আছে, সে কলেজে এই বিষয়ে গুচ্ছ ব্যবস্থার কারণে মানবিক শাখায় খুব অল্প ছাত্র ভর্তি হয়েছে। বেশ কয়েকটি বেসরকারী কলেজে ইসলামী শিক্ষায় অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স খোলা হয়েছে। ইসলামী শিক্ষায় চাকুরীর সুযোগ কলেজগুলোতে সংকুচিত হচ্ছে বুঝতে পেরে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্সে খুব অল্প ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি হচ্ছে। বেসরকারী কলেজগুলোতে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্সের শিক্ষকদের কোন সরকারী বেতন সহায়তা নেই। কলেজ কর্তৃপক্ষই এসব শিক্ষকদের পুরো বেতন দিয়ে থাকেন। কিন্তু এখন ছাত্র/ ছাত্রী ভর্তি খুব কম হওয়ায় শিক্ষকদের বেতন দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। বেসরকারী কলেজগুলোতে নির্ধারিত আসন সংখ্যা পূরণ হয় না। এ অবস্থা চলতে থাকলে অদূর ভবিষ্যতে কলেজ কর্তৃপক্ষ নিজেই ইসলামী শিক্ষার অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স বন্ধ করে দিতে বাধ্য হবে। অথচ দু'এক বছর আগে এ সকল কোর্সে ছাত্র/ছাত্রীদের আসন সংখ্যার অতিরিক্ত ভর্তির জন্য আবেদন করত। কিন্তু সবাইকে ভর্তি করা যেত না, ফলে কলেজ কর্তৃপক্ষকে বিব্রতকর পরিস্থিতি অতিকষ্টে সামাল দিতে হত।

সরকারী কলেজে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্সে পাঠদানের অবস্থা আরও করুণ। ১৯৯৬ সালে দশটি সরকারী কলেজে প্রয়োজনীয় শিক্ষকের পদ সৃষ্টি ও তা পূরণের শর্ত সাপেক্ষে ইসলামী শিক্ষার মাস্টার্স কোর্স খোলা হয়। অতিশয় পরিতাপের বিষয় যে, সংস্থাপন মন্ত্রণালয় দীর্ঘদিন টালবাহানা করে এ দশটি কলেজের মধ্যে ৯টি কলেজেই এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করেনি। শুধু কবি নজরুল সরকারী কলেজে দু'তিনটি পদ আরবীর জন্য সৃষ্টি হয়েছে। আরও দুঃখজনক ব্যাপার, বাংলাদেশে তিনটি কলেজ যথা ঃ কবি নজরুল সরকারী কলেজ, বগুড়া আযিযুল হক কলেজ এবং রাজশাহী কলেজ ব্যতীত বাকী সকল কলেজে যেখানে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা আছে সেখানে দুটির বেশী শিক্ষকের পদ নেই। অনার্স/ মাস্টার্স কোর্স আছে এরূপ অনেক কলেজে ২ জন শিক্ষকও বর্তমানে কর্মরত নেই। খুলনা বিএল কলেজ ও রংপুর কারমাইকেল কলেজে যারা সহকারী অধ্যাপক ছিলেন তাদেরকে অন্যত্র বদলি করা হয়েছে। কিন্তু তাদের স্থানে আর কেউ নিয়োগ পাননি। ফলে এসকল কলেজে একজন মাত্র প্রভাষক মাস্টার্স কোর্স চালাচ্ছেন। এরূপ আরো কলেজ আছে বলে ধারণা করা যায়।

প্রসংগত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিষয়ক দুটির শিক্ষকদের সর্বাধিক ক্ষতি করেছে ১৯৮৩ সালে এনাম কমিটি। এনাম কমিটির রিপোর্টে নীতিগতভাবে স্বীকার করা হয়েছে যে, প্রতিটি ডিগ্রী কলেজে প্রতি বিষয়ে ৪ জন করে শিক্ষক থাকবেন (১ জন সহযোগী অধ্যাপক, ১ জন সহকারী অধ্যাপক ও ২ জন প্রভাষক)। কিন্তু এই কমিটির রিপোর্ট প্রতিটি পাস/ ডিগ্রী কলেজে যেখানে আরবী ও ইসলামী স্টাডিজ আছে, সেখানে ১ জন সহকারী অধ্যাপক ও ১ জন প্রভাষকের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। অথচ আরবী ও ইসলামী শিক্ষা দু'টি স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে এখানে পদ সংখ্যা সৃষ্টি করা উচিত ছিল ৪×২=৮টি। এনাম কমিটির রিপোর্ট প্রকাশের আগে অনেক কলেজে পদ সংখ্যা অনেক বেশী ছিল। উদাহরণস্বরূপ ঢাকা কলেজের ১৯৭২ সালে আরবী বিভাগে পদ সংখ্যা ছিল ৪টি। এনাম কমিটির রিপোর্ট প্রকাশের পরবর্তী সময়ে যে সকল কলেজ জাতীয়করণ করা হয়েছে সেগুলোতে সেখানে ইসলামী শিক্ষা আছে যেখানে ১টি পদ আছে। জাতীয় করণের পরে আর কোন পদ সৃষ্টি হয়নি।

এনাম কমিটির বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সরকারী কলেজের শিক্ষকগণ বহুবার শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ওএন্ডএম উইং- এ প্রতিকার চেয়ে আবেদন করেছেন। কিন্তু সংস্থাপন মন্ত্রণালয় আজ পর্যন্ত এই বৈষম্য নিরসনের কোন